PAPER CUTTING august 2023

সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

9000+ WBCS aspirants

জুড়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

WHATSAPP - 8537872204

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Duttapukur Blast জতুগৃহ

খাগড়াগড়, নৈহাটি, এগরা, দত্তপুকুর— বৃত্ত কি সম্পূর্ণ হল? না কি এখনও আরও অনেক প্রাণের বলি হওয়া বাকি? রাজ্যে বেআইনি বাজি কারখানা এবং তার বিপদ নিয়ে ইতিমধ্যেই বহু শব্দ খরচ করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক কম হয়নি, পুলিশ-প্রশাসনও নাকি নিয়মিত নজর রাখে বলে শোনা যায়। অথচ, বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ বা মৃত্যুমিছিল বন্ধের লক্ষণ নেই। এগরা বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যুর পর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। নবান্ন থেকে নাকি নির্দেশ গিয়েছিল, রাজ্যের সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার এবং বেআইনি বাজি কারখানার কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে স্থানীয় থানাকে সতর্ক থাকার কথাও বলা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও দত্তপুকুর কাণ্ড রোখা গেল না কেন? প্রশ্ন জাগে, মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ মান্য করা হয় না, সে দায় কার— মন্ত্রীর? নেতার? বড় পুলিশকর্তার? না ছোট পুলিশকর্মীর? এই শেষ ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশকর্মীদের প্রতি কঠোর ভর্ৎসনা ধাবিত হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর আজ দরকার: সত্যিই কি ‘বড়’দের সদিচ্ছা থাকলে ‘ছোট’দের দিয়ে এ কাজ করানো এতটাই কঠিন হত? কর্মীদের কি সত্যিই এত সাহস আছে যে, তাঁরা কর্তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দেবেন? না কি এই শাসন, ভর্ৎসনা, সবই শেষ অবধি লোকদেখানো? রাজ্যের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই বাজি-দুর্নীতির শিকড় এতই গভীরে যে, প্রশাসনের তরফে তার নিরাময় আশা করাই ভুল?

সে দিক দিয়ে দেখলে, গত রবিবারের সকালে দত্তপুকুরে যা ঘটল, তাকে আর নিছক ‘দুর্ঘটনা’ বলা চলে না। পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই তাকে ঘটতে দেওয়া হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায় ‘কম নয়’ বলাটা যথেষ্ট নয়, বস্তুত পুরোটাই প্রশাসনের দায়। পুলিশের কথাই ধরা যাক। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাজি কারখানা স্থাপন-সহ সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করে কার্যত তাদের চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে এই বাজি-সাম্রাজ্য। অথচ, কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে তেমন কোনও কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়নি। স্থানীয়রা বাজি তৈরির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিলে উল্টে অভিযোগকারীদেরই ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ কি নিচু স্তরের পুলিশকর্মীদের যথেচ্ছাচার বলে মেনে নেওয়া সম্ভব? নাগরিক সমাজকে কি এতই নির্বোধ ভাবে বর্তমান প্রশাসন? বেআইনি কারখানার বাজিবারুদ শুধুমাত্র উৎসবের দিনে নয়, গণতন্ত্রের উৎসবেও নির্বিচারে ব্যবহৃত হয় বলে শোনা যায়। পুলিশ-প্রশাসনের উঁচু মহলের নীরব প্রশ্রয় কি সেই জন্যই? অঘটন ঘটলে নিয়মমাফিক প্রশাসনের আশ্বাস, কিছু দিন বেআইনি বাজি উদ্ধার, এবং ধরপাকড়ের প্রহসন। তার পর উত্তেজনা থিতিয়ে পড়লে ফের বারুদের কারবার যথা পূর্বম্। এই কুনাট্যই সযত্নে রচিত হয়ে চলছে এই রাজ্যে।

নাগরিক সমাজকে আর এক বার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, বেআইনি বাজি কারখানার সঙ্গে শুধুমাত্র মানুষের নিরাপত্তা নয়, পরিবেশের প্রশ্নটিও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। বেআইনি বাজি তৈরির কারখানায় যে ধরনের রাসায়নিক এবং ধাতু ব্যবহার করা হয়, পরিবেশের উপর সেগুলির প্রভাব মারাত্মক। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক উদাসীনতায় সেগুলির অবাধ ব্যবহার হচ্ছে। এক দিকে সবুজ বাজি তৈরির ক্লাস্টারের কথা বলে মুখরক্ষার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অন্য দিকে প্রশাসনের চোখের সামনে, সম্ভবত অবাধ প্রশ্রয়ে ও উৎসাহে চলেছে নিয়মভাঙার খেলা। রাজ্যকে এই ভাবে জতুগৃহে পরিণত করা থেকে নিবৃত্ত হোক প্রশাসন— এ কোনও অনুরোধ উপরোধ প্রস্তাব বা পরামর্শ নয়, অত্যন্ত জরুরি দাবি। নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা ও সুস্থতার স্বার্থে।

Cleanliness দায়সারা

কাকে বলে সৌন্দর্যায়ন? তার মধ্যে তো শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটিতে নজর দেওয়াও পড়ে? তা হলে কলকাতার ‘সৌন্দর্যায়ন’-এ বিশ্বাসী প্রশাসনকে ব্যর্থ বলতে হয়। কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তা, বিশেষত ফুটপাত এবং একাধিক উড়ালপুলের নীচের অংশের পরিস্থিতি দেখে বোধ হয় না যে, পুর-প্রশাসনের আদৌ এই বিষয়ে কোনও ভাবনা আছে। মশার বাড়বাড়ন্ত থেকে একের পর এক অসুখের প্রকোপ বাড়ছে। এই মরসুমে ডেঙ্গির কবলে পড়েছে শহরের বিভিন্ন অংশ। অথচ, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্লাস্টিকের ছাউনিতে বৃষ্টির জল জমে তাতে এন্তার মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে। এই জল জমার পরিণতি কী হতে পারে, পুর-প্রশাসনের কি তা অজানা? গড়িয়াহাটের অগ্নিকাণ্ড-পরবর্তী কালে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ফুটপাত থেকে প্লাস্টিকের ছাউনি তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই কাজ বিশেষ এগোয়নি। সম্প্রতি মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার আশ্বস্ত করেছেন, পুরসভা সমস্ত রাস্তার দোকান থেকে ধাপে ধাপে প্লাস্টিকের ছাউনি সরিয়ে ফেলবে। যেখানে সমস্যা এবং সমাধানের পথটি জানা, সেখানেও যদি এখনও কাজ প্রতিশ্রুতির স্তরেই আটকে থাকে, কাজটি আদৌ হবে তো?

সমস্যা শুধুমাত্র প্লাস্টিক ছাউনি ঘিরেই নয়। কলকাতার ফুটপাত এবং রাস্তা অসংখ্য মানুষের বাসস্থানও বটে। তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু, বাতিল ফ্লেক্স, প্লাস্টিকের বোতল, কাচের শিশি, কাঠের টুকরোর ছড়িয়ে থাকা— এই শহরের চিরপরিচিত ছবি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বছরের গোড়ার দিকে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, তিনি শহরের পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে বলেছেন, ফুটপাতে বসবাসকারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের আশ্রয়হীনদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ করতে। সেই কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে? অভিযোগ, মেয়রের এ-হেন নির্দেশের পরও বহু জায়গায় পুলিশ আসে, রাস্তার বাসিন্দাদের শুধুমাত্র নামটুকু লিখেই বিদায় নেয়। ফুটপাত দখলমুক্ত করা, সেখানকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রশ্ন রাজনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত কারণে বড়। এই মুহূর্তে সেই প্রশ্নের সার্বিক ও সুসংহত উত্তর খোঁজার মতো অবস্থায় যদি পুরসভা বা সরকার না-ও থাকে, তার জন্য শহরের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার কাজটি আটকে থাকতে পারে না। ফুটপাতে বাধাহীন ভাবে হাঁটার অধিকারের দাবি যদি নাগরিকরা আপাতত ত্যাগও করেন, সেখানে জমে থাকা নোংরায় জন্মানো মশার কামড় খেতে তাঁদের বাধ্য করা চলে না।

সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ থাকলে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজটি যে সম্ভব, তারও প্রমাণ আছে। কলকাতার গুরুদ্বারগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজ অনেকটাই এগিয়ে, এ দিকে সেই একই ছবি শহরের অন্যান্য ধর্মস্থানে অনুপস্থিত। যেখানে প্রতি বছর ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়, সেখানে পরিচ্ছন্নতার মূল বিধিগুলির প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। পুর-প্রশাসনকে এই বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট দল তৈরি করতে হবে, যাঁরা সারা বছর ধরে কাজটি করবেন। নিয়ম-অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তি বিধানও জরুরি। শুধুমাত্র জল জমার ক্ষেত্রগুলিকে নির্দেশ করে এবং নাগরিক অসচেতনতার দোহাই দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Economy of West Bengal হাঁড়ির হাল?

কদর্য ব্যক্তিগত আক্রমণ, ‘তুই বেড়াল না মুই বেড়াল’-এর তরজা পেরিয়ে রাজ্য রাজনীতির তর্ক যদি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে চলে, তাতে আপত্তি করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তবে, এই উত্তর-সত্য রাজনীতির যুগে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা জরুরি। বিশেষত, অর্থনীতি এমন একটি বিষয়, যা প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে প্রভাব ফেলে, কিন্তু সেই তর্কের সত্যাসত্য যাচাই করার সামর্থ্য সব নাগরিকের সমান নয়। এ মাসের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ‘প্রকৃত অবস্থা’ আলোচনা করতে। পশ্চিমবঙ্গে ঋণের ভারে কাবু, বিবেচনাহীন দাতব্যের পথে হেঁটে রাজ্যের অর্থনীতির হাঁড়ির হাল হয়েছে, এই কথাগুলি যে শুধুমাত্র বিরোধী দলের প্রচারেই শুনতে পাওয়া যায়, তা নয়— গত এক-দেড় বছরে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক বার এই কথা বলেছে, রাজ্যকে সতর্ক করে দিয়েছে। ফলে, অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনীতির ভাষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীর হবে, তা বোঝা যায়। প্রশ্ন হল, রাজ্যের অর্থনীতির অবস্থা ঠিক কতখানি খারাপ? রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে যদি মাপতে হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দেশের মধ্যে ছ’নম্বরে। মাথাপিছু উৎপাদনের প্রশ্নে খানিক পিছিয়ে, তবে বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কখনও মাঝামাঝির চেয়ে খারাপ নয়। আর্থিক বৃদ্ধির হারও সাড়ে দশ শতাংশের কাছাকাছি। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠছে, এমন দাবি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়।

যাঁরা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিচলিত, তাঁদের মূল উদ্বেগ ঋণের পরিমাণ নিয়ে। ঋণের মোট বোঝা কতখানি, সে হিসাব বহুলাংশে অপ্রয়োজনীয়, ঋণ কতখানি বিপজ্জনক, তা নির্ভর করে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যের উপরে। পরিশোধের সামর্থ্যের নিরিখে ঋণের বোঝার ‘বিপদ’ বিচার করার মাপকাঠি হল রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত হিসাবে ঋণের পরিমাণটিকে দেখা। মুখ্যসচিব মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাতটি নিম্নমুখী। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে এই রাজ্যে ঋণের বোঝা যতখানি বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি অনুপাতে বেড়েছে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ। পশ্চিমবঙ্গ দেশের সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত রাজ্যগুলির তালিকায় রয়েছে বটে, কিন্তু সেই ঋণ রাজ্যের সাধ্যাতীত, এমন দাবি করার কোনও কারণ নেই। বস্তুত, কোন রাজ্যের ঋণ কতখানি সাসটেনেব্‌ল বা সুস্থায়ী, সে বিষয়ে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক একটি সমীক্ষা করেছিল। এ রাজ্যের ঋণের উপরে প্রদত্ত সুদের হারের চেয়ে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির হার যে-হেতু সব সময়ই বেশি, ফলে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষাও এই ঋণকে যথেষ্ট বিপজ্জনক বলে মনে করেনি। ফলে, রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যে ‘উদ্বেগ’ নিয়মিত শোনা যাচ্ছে, তার পিছনে অর্থনৈতিক যুক্তি যতখানি রয়েছে, তার চেয়ে রাজনৈতিক কারণই বেশি বলে অনুমান করা চলে।

তা হলে কি রাজ্যের আর্থিক পরিচালনা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা চলে? একেবারেই নয়। রাজ্যের ঋণের বোঝা সাসটেনেব্‌ল হলেও অদূর ভবিষ্যতে এসজিডিপি-র অনুপাতে তা যে কমবে না, এই বাস্তবের পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। ঋণের পরিমাণ বাড়ামাত্রই সমস্যার কারণ নয়— কিন্তু কোন কাজে সেই ঋণের টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। ঋণের টাকার সিংহভাগ যদি বেতন আর পেনশন দিতেই খরচ হয়ে যায়, তবে তা রাজ্য অর্থনীতির পরিচালনা সম্বন্ধে ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে না। তবে, রাজ্যের মোট রাজস্ব আদায়ের কত শতাংশ বকেয়া ঋণের উপর সুদ মেটাতে খরচ হয়, সেই অনুপাতটি গত কয়েক বছর ধরে নিম্নমুখী। অর্থাৎ, ঋণ বাড়া সত্ত্বেও উন্নয়নখাতে খরচের মতো অর্থের পরিমাণও বাড়ছে। সে টাকা কী ভাবে খরচ হচ্ছে, সে দিকে নজর রাখার দায়িত্বটি বিরোধীরা নিতেই পারেন।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Jadavpur University Student Death চক্রবৎ?

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ— এই লোকপ্রবাদই কি তবে প্রমাণসিদ্ধ, সত্য? ক্ষমতা হাতে পেলে ক্ষমতার অপব্যবহারই নিতান্ত স্বাভাবিক? যাদবপুরের ছাত্রাবাসে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গণপরিসরে যুগপৎ যে অনুভূতিগুলি ঘোরাফেরা করছে তার অন্যতম এই 'বিস্ময়': আজ যে উঁচু ক্লাসের বা প্রাক্তন ছাত্রদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে, প্রথম বর্ষে তারাই হয়েছিল র‍্যাগিংয়ের শিকার। আজ যে র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছে, উঁচু ক্লাসে উঠে সে-ই 'সিনিয়র'-রূপে ফিরে আসবে র‍্যাগিং করতে। এ এক অমোঘ চক্র, যেখানে শিকারি ও শিকার, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন উভয়েই তাকিয়ে আছে সময়ের দিকে; ক্ষমতাবান একদা ক্ষমতাহীন ছিল বলেই আজ সুযোগ বুঝে 'হাতের সুখ' করে নিচ্ছে, আর ক্ষমতাহীনও জানে শুরুর একটা বছর কোনও মতে পার করাই লক্ষ্য, তারও শিকারি হয়ে ওঠা 'সময়ের অপেক্ষা'।

জনমনকে আরও যা অবাক করেছে তা হল, র‍্যাগিংয়ে জড়িত বা অভিযুক্ত ছেলেগুলি প্রায় সকলেই ছোট শহর, মফসস্‌ল বা গ্রাম থেকে আসা। হস্টেল কলকাতার বাইরের পড়ুয়াদের জন্যই, সেখানে জুনিয়র-সিনিয়র সকলেই দূর শহর বা গ্রাম থেকে আসবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় বিচিত্র আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সমাগমস্থল, খাস কলকাতার কেতাদুরস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে গ্রাম-মফস্‌সলের ছেলেমেয়েরা সেখানে খানিক জড়সড় থাকে। কিন্তু সে কারণেই কি ছাত্রাবাসে জুনিয়র ছাত্রদের আরও আগলে রাখা, স্বস্তিতে রাখাই সিনিয়রদের দায়িত্ব নয়? বিশেষত সেই সিনিয়রদের, যারা এই আড়ষ্টতা হীনম্মন্যতা ও অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা-অবহেলাও পেরিয়ে এসেছে মাত্র কিছু দিন আগে? যাদবপুরে, এবং আরও বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসেই তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে র‍্যাগিংয়ে মেতে উঠছে এই উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই, দূরে গ্রামের বাড়িতে অভিভাবকেরা তা জানতেও পারছেন না। আবার উচ্চমাধ্যমিক পাশ-করা লাজুক মুখচোরা ছেলেটিকে এমন কোনও অভিভাবকই সরল বিশ্বাসে সঁপে দিয়ে যাচ্ছেন একই এলাকা থেকে আসা কোনও সিনিয়র ছাত্রের কাছে, র‍্যাগিং-যন্ত্রের মুখে।

এ থেকেই স্পষ্ট, র‍্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভূমিকা গৌণ; ক্ষমতা, তার বহিঃপ্রকাশ ও অপব্যবহারের তৃপ্তিই মুখ্য। যাদবপুরের ঘটনার সূত্রেই মনোবিদরা দেখাচ্ছেন সমাজের অন্য পরিসরগুলিতেও র‍্যাগিংয়ের সমধর্মী ছবি— নতুন বৌ হয়ে এসে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের শিকার মেয়েটিই কালক্রমে শাশুড়ি রূপে পুত্রবধূর উপর খড়্গহস্ত; কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা হওয়া মানুষটি ক্রমে উঁচু পদে আসীন হয়ে অধস্তন-পীড়নেও হয়ে উঠছেন অভিজ্ঞ। ছাত্রমহলে কান পাতলে শোনা যাবে, যে শিক্ষক নিজে ছাত্রজীবনে ভাল নম্বর পাননি, শিক্ষক হয়ে তাঁর নম্বর দেওয়ার হাতটিও হয়ে পড়ে কৃপণ। এই সব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একশৈলিক একরৈখিক নয়, তার অন্দরে-কন্দরে রয়েছে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল ঘুরপ্যাঁচ, আলোআঁধারি। তাতে গোড়ার কথাটি মিথ্যা হয়ে যায় না— ক্ষমতা হাতে পেলে রাজনৈতিক দল থেকে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত বিহ্বল লাগামছাড়া হয়ে পড়ার আশঙ্কাটি ষোলো আনা। ছাত্রসমাজও ব্যতিক্রম নয়, শুধু তারা এখনও অপরিণতমনস্ক বলেই পরিণতিটি বেশি ভয়ঙ্কর।

Toilet Man Bindeshwar Pathak স্বচ্ছতার সৈনিক

বিন্দেশ্বর পাঠকের জীবনাবসান ঘটল স্বাধীনতা দিবসে। ‘সুলভ শৌচালয়’ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বিন্দেশ্বর ভারতকে সুষ্ঠ, সুস্থায়ী এবং সম্মানজনক শৌচ ব্যবস্থার পথ দেখিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কাজ করেছিলেন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। নিম্নবর্ণের যে মানুষদের বর্জ্যবাহীর ভূমিকা নিতে বাধ্য করত সমাজ, তাদের সে কাজ থেকে মুক্ত করে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের পথও তিনি দেখিয়েছিলেন। আক্ষেপ, এ দুটো কাজ— যা সভ্য সমাজের ন্যূনতম শর্ত— ভারতে আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে ভারতকে উন্মুক্ত শৌচ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেও, পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৯-২১) দেখিয়েছে যে, ভারতে অন্তত কুড়ি শতাংশ গৃহের সদস্যরা এখনও উন্মুক্ত শৌচে অভ্যস্ত, এবং গ্রামীণ ভারতে চব্বিশ শতাংশ গৃহস্থালিতে এখনও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। শহরের পরিসংখ্যান তুলনায় ভাল, কিন্তু নগরবাসী মাত্রেই জানেন, মহানগরের রূপ সকলের জন্য এক নয়। বস্তিগুলিতে এখনও দেখা যায়, তিরিশ-চল্লিশটি পরিবারের জন্য একটিমাত্র শৌচাগার রয়েছে। তদুপরি, শহরের রাস্তা মাত্রেই উন্মুক্ত শৌচাগার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সে দৃশ্যও সর্ব ক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভারত সরকার সংস্কার এনেছে আইনে— মানববর্জ্য বহনে কোনও মানুষকে নিয়োগ করা চলবে না (১৯৯৩), মানুষকে নিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা নিকাশি নালা পরিষ্কার করার কাজও করানো যাবে না (২০১৩)। তা সত্ত্বেও ভারতে এই সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ অব্যাহত। ২০২১ সালে সংসদে পেশ করা তথ্য অনুসারে, ভারতে ২০১৬-২১ সালের মধ্যে শৌচ ও নিকাশি নালা পরিষ্কার করতে গিয়ে ৩২১ জন নিহত হয়েছেন। অসরকারি সংস্থাগুলির দাবি, সংখ্যাটি আরও বেশি।

মানববর্জ্যবাহী দলিত পরিবারগুলি কী অমানবিক পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকে, তা সমাজতত্ত্বের গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছিলেন বিন্দেশ্বর পাঠক। একটি ঘটনা তাঁকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করেছিল— এক বালক ষাঁড়ের আক্রমণের সামনে পড়লে অনেকে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। কিন্তু ছেলেটি বর্জ্যবাহী দলিত জাতির, সে কথা কেউ বলামাত্র সকলে পিছিয়ে যায়, বালকটিকে ‘নির্বিঘ্নে’ হত্যা করে ষাঁড়। গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ বিন্দেশ্বর স্বাস্থ্যকর শৌচাগার নির্মাণ, এবং দলিতদের অন্য কাজে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন সত্তরের দশকে। বহু চেষ্টার পর তাঁর উদ্ভাবিত শৌচাগারের মডেলকে গ্রহণ করে বিহার সরকার। ক্রমে তা ছড়ায় সারা দেশে। এই নির্মাণে বর্জ্যকে বায়োগ্যাস এবং জৈব সার-সমৃদ্ধ সেচের জলে পরিণত করার উপায়ও রয়েছে।

ভারতীয়দের স্বভাব হল আদর্শবাদী, কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে বহু সম্মান দানের ঘটা করে, কাজের বেলা তাঁর আদর্শটিকে উপেক্ষা করা। বিন্দেশ্বর পাঠকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতীয় রেল আজও মানব বর্জ্যবাহকদের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা। বিভিন্ন পুরসভাও নিয়মিত তাদের নিয়োগ করে। উন্মুক্ত শৌচ কেন দূর হচ্ছে না, সেই আলোচনাতেও ভাটা পড়ছে সরকারি অনাগ্রহে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গান্ধীজির চশমাটিকে নিয়েছে, তাঁর আদর্শের অন্তর্নিহিত দর্শনটিকে গ্রহণ করতে পারেনি। নয়তো সরকার মনে রাখত যে, যত দিন এক জনও নিম্নবর্ণের মানুষ মানববর্জ্য বইবেন, তত দিন ভারত স্বাধীন দেশ নয়।

Jadavpur University Student Death শেষরক্ষার দায়

একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর সূত্র ধরে যে ভয়াবহ ব্যাধির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, তার নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন যথাযথ চিকিৎসা, পরিচর্যা ও শুশ্রূষা। তার দায় কেবল তার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিচালকদের নয়, গোটা সমাজেরই। পশ্চিমবঙ্গের গর্ব করার মতো সামগ্রী আর খুব বেশি অবশিষ্ট নেই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই তাদের অন্যতম, বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন মাপকাঠিতেই তার স্থান দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। পরিকাঠামো এবং সংসাধনের বহু অভাবের মধ্যে বিস্তর লড়াই করে উৎকর্ষের এই মান তাকে রক্ষা করতে হয়েছে, যে অভাবের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের দায় বিপুল, রাজ্য সরকারের দায়িত্বও কম নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষ আবশ্যক ছিল হাল ফেরানোর এক সর্বাত্মক প্রয়াস। বিপর্যয়ের অভিঘাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ সেই প্রয়াসের শরিক হবেন এবং রাজ্যের স্বার্থে রাজনীতিকরা সব ক্ষুদ্রস্বার্থ সরিয়ে রেখে সমবেত ভাবে তাতে সহযোগিতা করবেন, এমনটাই কাম্য ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৯ অগস্টের ঘটনার ‘সুযোগ’ নিয়ে কার্যত প্রথম দিন থেকে দলীয় রাজনীতির উৎকট লড়াই চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ‘অরাজনৈতিক’ ছাত্র সংগঠনের অনন্ত রেষারেষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরটি আক্ষরিক অর্থেই রণভূমিতে পরিণত, আঠারো দিনেও তার অবসানের ভরসা নেই। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তাঁদের আচরণে দেখা গিয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির কদর্য রূপ, যা কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লজ্জাকর। একেবারে প্রথম পর্বেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যাদবপুর এখন ‘আতঙ্কপুর’। রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমন অভিধায় নিন্দিত করতে পারেন! শুধু তা-ই নয়, তদন্ত প্রক্রিয়ার তোয়াক্কা না করে— এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে— তিনি এই ঘটনার জন্য ‘কিছু আগমার্কা সিপিএম’কে দোষী বলে রায় ঘোষণা করে দিয়েছেন! উল্টো দিকে, রাজ্য বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা যাদবপুরে হাজির হয়েছেন এবং ধর্না-মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘তুলে ফেলে দেব’, ‘উপড়ে ফেলব’, হিসেব বুঝে নেব’ ইত্যাদি মহান বাণী সম্প্রচার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জেএনইউতে ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’কে যে ভাবে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যাদবপুরেও সেই প্রক্রিয়া বলবৎ হবে! স্পষ্টতই, শাসক এবং বিরোধী, দুই তরফের শীর্ষস্থানীয় নায়কনায়িকারা বিশ্ববিদ্যালয় তথা পশ্চিমবঙ্গের সুস্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নন, তাঁরা একটি খেলাই খেলতে জানেন।

এই সর্বগ্রাসী ক্ষমতাতন্ত্রের বিপদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে তার বড় দায়িত্ব নিতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। দলীয় রাজনীতির ঘেরাটোপে নয়, অরাজনৈতিক নামাবলির আড়ালেও নয়, যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তার জন্য কোনও মহামিলনের স্বপ্ন রচনার প্রয়োজন নেই, বরং স্বাভাবিক মতানৈক্য সঙ্গে রেখে পারস্পরিক সংলাপ ও যৌথ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেই সেই অগ্রগতি স্থায়ী হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন, গবেষণা এবং সামগ্রিক পরিবেশ কী ভাবে স্বাস্থ্যবান হতে পারে, সেটাই এই অনুশীলনের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে এক দিকে যেমন ক্ষমতার অধীশ্বরদের উপর সমস্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য চাপ দেওয়া দরকার, অন্য দিকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং পরিবেশের সংস্কারও নিশ্চিত করা দরকার। দু’টি কাজ একমাত্র পরস্পরের সহায়তাতেই বাস্তবায়িত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসর্বস্ব দলীয় রাজনীতি এবং তার প্রতাপ-অন্ধ কারবারিদের থেকে প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার প্রশ্নটি এখন প্রায় শেষরক্ষার প্রশ্ন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার উত্তর সন্ধানের পরিসর হয়ে উঠতে পারবে কি?

Forest (Conservation) Amendment Bill জঙ্গল দখলের পথ তৈরি করা

সম্প্রতি সংশোধিত বন-সংরক্ষণ আইন ২০২৩ সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে গেল। এই আইনের প্রস্তাবনায় বিভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলা আছে। যেমন— ২০৭০ সালের মধ্যে 'নেট কার্বন নিঃসরণ শূন্য' ভারত গড়ার লক্ষ্য, বন ও বৃক্ষ-আচ্ছাদন বাড়ানোর লক্ষ্য, অর্থনৈতিক-সামাজিক সুবিধা, বিশেষত জঙ্গলে বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্য ইত্যাদি। কিন্তু কী ভাবে হবে, সেটা স্পষ্ট বলা নেই। বরং কতটা বনভূমি বন-সংরক্ষণ আইনের বাইরে রাখা যায়, এটি তারই এক প্রয়াস।

এই সংশোধিত আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারা হল বনের সংজ্ঞা নির্ধারণ। বন-সংরক্ষণ আইনের আওতায় সেই সব বনভূমিকে ধরা হবে, যা ১৯২৭ ভারতীয় বন আইন অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর ১৯৮০ বা তার পরে নথিভুক্ত করা আছে। দ্বিতীয়ত, যে সব বনভূমি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের আগে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই সব জমিও এই আইনের আওতায় পড়বে না। এই ধরনের বন, যেটাকে বন দফতরের পরিভাষায় 'আনক্লাসড ফরেস্ট' বলা হয়, সেটা প্রায় নথিভুক্ত বনের ২৮ শতাংশ। এই সঙ্কুচিত বনের সংজ্ঞা বিখ্যাত টি এন গোদাভরমন মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ে বনের সংজ্ঞাকে অর্থহীন করার চেষ্টা। ১৯৮০ সালের বন-সংরক্ষণ আইনের ২নং ধারায় সুপ্রিম কোর্ট বর্ণিত বনভূমি হল: যে কোনও বনজমি, যা সরকারি খাতায় নথিভুক্ত আছে। এই প্রসারিত সংজ্ঞা বন-সংরক্ষণে অনেকটা সাহায্য করেছে। তথ্য বলছে, ১৯৫০-১৯৮০'র মধ্যে প্রায় ৪২ লক্ষ হেক্টর বনভূমি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বন-সংরক্ষণ আইন ১৯৮০ প্রবর্তনের পর থেকে গত চল্লিশ বছরে মাত্র ১৫ লক্ষ হেক্টর হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য বনভূমি হস্তান্তরে ছাড়পত্র পেতে হলে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের বন উপদেষ্টা কমিটির অনুমতি দরকার হয়। সম্ভবত এই কারণে বনভূমির চরিত্র বদলে এই শ্লথ গতি।

আবার অনেক জঙ্গল এলাকা আছে যেটা সরকারের খাতায় বন বলে নথিভুক্ত নয়। এর বেশির ভাগই সমষ্টিগত জঙ্গল বা 'কমিউনিটি ল্যান্ড'। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত, ওড়িশা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে এই ধরনের বনভূমি আছে। নতুন আইনে এই সব জঙ্গলে বসবাসকারী অধিবাসীদের নতুন করে বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা। কারণ, এই সব জঙ্গল সংশোধিত বন-সংরক্ষণ আইনের বাইরে থাকছে। ফলে এই সব প্রাকৃতিক জঙ্গল কোনও রকম বাধা ছাড়াই বিভিন্ন প্রকল্পের নামে বেসরকারি পুঁজিপতির হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ২০০৯ সালে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিল, এখন থেকে বন-সংরক্ষণ আইন ১৯৮০ অনুযায়ী অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য জমির চরিত্র বদল করার ছাড়পত্র দেওয়া যাবে একমাত্র বন-অধিকার আইন ২০০৬ সম্পূর্ণ ভাবে বলবৎ করার পরেই। বন-অধিকার আইন অনুযায়ী, জঙ্গলের বসবাসকারীদের গ্রামসভার অনুমতি ছাড়া বনের জমির চরিত্র বদল করা যাবে না। এই আইনের বলেই খনিজ ও লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ বিভিন্ন রাজ্যে বহু প্রকল্প আটকে রয়েছে বা বাতিল হয়েছে। যেমন, ওড়িশার রায়গড়া জেলার নিয়মগিরি পাহাড় ও সংলগ্ন বনভূমি থেকে বক্সাইট খনন রোধ করা সম্ভব হয়েছিল ওখানকার ডোংরিয়া কোন্ধ আদিবাসীদের ১২০টি গ্রামের গ্রামসভার অনুমতি ছিল না বলে। আশ্চর্যজনক ভাবে সংশোধিত বন-সংরক্ষণ আইনে বন-অধিকার আইন ২০০৬-এর উল্লেখ নেই।

সংশোধিত আইনে আরও বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ও কৌশলগত কারণে সেনাবাহিনী ছাড়া সরকারও 'লিনিয়র প্রোজেক্ট' তৈরি করতে পারে এই বনভূমিতে। তার জন্য সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা এই আইনের বাইরে রাখা হচ্ছে। এ ছাড়া ১০ হেক্টর বনভূমি নিরাপত্তাজনিত পরিকাঠামো তৈরি এবং রেল ও রাস্তার ধারে ০.১ হেক্টর বনভূমি আইনের বাইরে থাকছে। ফলে জীববৈচিত্রের 'হটস্পট' হিসাবে চিহ্নিত গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত, সিকিম, আরাবল্লী পর্বতমালা বা উত্তরাখণ্ডে এই আইন বলবৎ হবে না। ইকোটুরিজ়ম বা চিড়িয়াখানা ও সাফারি প্রকল্পের বনভূমিও আইনের আওতার বাইরে রাখা হবে।

অবশ্য সংশোধনীতে এ-ও বলা হয়েছে, নথিভুক্ত বনের বাইরে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে বনসৃজনের মাধ্যমে বনআচ্ছাদন বাড়ানো হবে আরও ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন টনের কার্বন সিঙ্ক তৈরির লক্ষ্যে। মনে রাখতে হবে, মোনোকালচার প্ল্যানটেশন-এর মাধ্যমে বনআচ্ছাদন বৃদ্ধি প্রকৃত বনভূমির বৃদ্ধি নয়। ভারতীয় বনসর্বেক্ষণ ২০২১-এর রিপোর্টে চা, পাম তেল, কফি, রাবার ইত্যাদির আবাদকে বনভূমি হিসাবে ধরা হয়েছে। ফলে এই আইনের বাইরে থাকা বনভূমিতে বেসরকারি উদ্যোগে এই ধরনের বাণিজ্যিক আবাদ উৎসাহ পাবে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক জঙ্গলের কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা 'মোনোকালচার প্লান্টেশন'-এর থেকে অনেক বেশি (একটি হিসাবমতো, প্রায় ৪০ গুণ)।

প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের সংশোধন বনভূমির বাণিজ্যিকীকরণে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এই সংশোধনে বনভূমির চরিত্র বদল হবে, কখনও নিরাপত্তার নামে, কখনও 'উন্নয়ন'-এর নামে। মনে রাখা প্রয়োজন, জঙ্গলকে 'পণ্য' হিসাবে দেখলে পরিবেশের বিপর্যয় অবধারিত। জঙ্গলকে দেখতে হবে বাস্তুতন্ত্র হিসাবে। একমাত্র তবেই জীববৈচিত্র বাড়বে। এবং শেষ পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে।

Child Education দুর্লভ দৃষ্টান্ত

যে সময়ে রাজ্যের শিক্ষাজগতের দিকে তাকাতেও ভয় আর লজ্জা পান সচেতন নাগরিক, তেমন এক সময়ে সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা কী, তা ফের মনে করালেন উস্তির দুই শিক্ষক, নীপা বসু ও সঞ্জয় দাস। বছর দশেকের দুই বালককে শ্রম থেকে শিক্ষায় ফেরালেন তাঁরা। দুঃস্থ পরিবার, অসুস্থ অভিভাবকের ভার বালকদেরই বহন করতে হচ্ছে, জানতে পেরে ওই দুই শিক্ষক উদ্যোগী হয়ে, পিতাকে বুঝিয়ে, বালক দু'টিকে ফিরিয়ে নেন স্কুলে। তাদের স্থান হয়েছে স্কুলেরই হস্টেলে। এই প্রতিবেদনের সত্যি গল্পটি সহজ মানবিকতার কাহিনি— একের অসহায়তায় অপরের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দেওয়া। বহু মানুষ এমন চেষ্টা করেন, কেউ একক উদ্যোগে, কেউ বা সংগঠিত ভাবে। এমন প্রতিটি কাহিনিই অমূল্য, কারণ এগুলিই শত দারিদ্র-ক্লেশকে অতিক্রম করে সমাজকে ধরে রাখে, জাতির ভিত্তি গঠন করে দেয়। তবে কেবল মানুষের প্রতি মানবিকতার প্রতি দায় নয়, ওই দুই শিক্ষক সময়ের দাবির প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন। কোভিড ভারতে জনস্বাস্থ্যের যত ক্ষতি করেছে, ততই বিপর্যস্ত করেছে স্কুলশিক্ষাকে। অভিভাবকের কর্মহীনতা এবং অসুস্থতা, এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত, এই দুইয়ের ফলে অগণিত শিশু স্কুলছুট হয়েছে। এদের কী করে ফেরানো যাবে স্কুলে, সেই প্রশ্নটি শিক্ষা দফতর এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত এড়িয়েছে। নানা অসার ঘোষণা হয়েছে, নানা বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান মিলেছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, সর্বত্রই শিশুশ্রমিকের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। শিশু দু'টিকে স্কুলে ফিরিয়ে বস্তুত ওই দুই শিক্ষক এক বৃহত্তর ব্যর্থতার প্রতি দেশকে সজাগ করলেন।

সামনে নিয়ে এলেন শিক্ষকের দায়বদ্ধতাকেও। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন, এগুলিই শিক্ষকের প্রধান কাজ ঠিকই, গত দুই দশকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল-ভিত্তিক বিবিধ শিশুকল্যাণ কার্যসূচির তদারকি। সর্বশিক্ষা মিশন, এবং পরে শিক্ষার অধিকার আইন স্কুলের বাইরের শিশুর প্রতি শিক্ষকের দায়বদ্ধতার কথাও বলে— স্কুল ড্রপ আউট ছাত্রদের ফিরিয়ে এনে, 'ব্রিজ কোর্স' পড়িয়ে তাকে শ্রেণি-উপযোগী পাঠগ্রহণের যোগ্য করাও শিক্ষকের কাজ। তবে অধিকাংশ সময়ে এ কাজগুলি হয় বড় জোর খাতায়-কলমে। সরকারি ব্যবস্থা যেখানে অপারগ বা অনিচ্ছুক, সেখানে শিক্ষকদের উদ্যোগ আরও বেশি প্রয়োজন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবদ্ধ না থেকে, শিক্ষক সংগঠনগুলি যদি এগিয়ে আসে, নিজেদের সদস্যদের নিয়োজিত করে স্কুলছুটকে স্কুলে ফেরানোর কাজে, সমাজ আরও লাভবান হবে। ছাত্রছাত্রীর কল্যাণ কি শিক্ষক-স্বার্থেরই অপর পিঠ নয়?

লক্ষণীয় স্কুলের পরিকাঠামোর বিষয়টিও। উস্তির দুই বালক স্কুলে ফিরতে পেরেছে স্কুলে হস্টেল আছে বলে। বহু ছেলেমেয়ে হস্টেলে থাকার সুযোগ না পেলে পড়াশোনা করতে পারবে না। অতি-দুঃস্থ পরিবারের সন্তান, পরিযায়ী শ্রমিকের সন্তান, যে শিশুদের অভিভাবক নেই অথবা অভিভাবক কোনও কারণে শিশুর যত্ন-সুরক্ষায় অক্ষম, তাদের আশ্রয়ও প্রয়োজন। সরকারি স্কুলগুলির উপরের তলাটিতে হস্টেল করার একটি কর্মসূচি সর্বশিক্ষা মিশনে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট প্রসার পায়নি। এ কাজটিকে এ বার অগ্রাধিকার দিতে হবে।

Fundamental Rights অন্ধকারের উৎস হতে

দেশভাগের যন্ত্রণায় দীর্ণ স্বাধীনতার ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়েছিল প্রথম পর্ব থেকেই, কিন্তু— কিছু সাময়িক ব্যতিক্রম বাদ দিলে— তার শিকড়টি দীর্ঘকাল অবধি অক্ষত ছিল। ছিল বলেই বহু আঘাত সহ্য করে এবং প্রতিহত করে স্বাধীন ভারত তার গণতন্ত্রের সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু বর্তমান শাসককুল গত ন'বছরে দেশটাকে অবিশ্বাস্য মাত্রায় বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতিরা স্বাধীনতা বলতে যা বুঝিয়েছিলেন, আজকের ভারত তা থেকে অনেক দূরে। সংবিধান এখনও আছে, এখনও তাকে যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে তার জায়গায় কোনও একটি সংহিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। ব্যক্তিনাগরিকের স্বাধীনতাই সেই সংবিধানের ভিত্তি, এই প্রাথমিক কথাটুকু এখনও সরাসরি অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু কার্যত? মণিপুর অথবা হরিয়ানা, যে দিকেই তাকানো যাক না কেন, নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের প্রক্রিয়াটি 'উদিত সূর্য'-এর মতোই স্পষ্ট। যাঁরা শাসকদের বিরাগভাজন, তাঁদের বিরুদ্ধে হিংস্র বিদ্বেষ ভয়াল রূপ ধারণ করলেও রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় এবং নীরব থেকে বুঝিয়ে দেয়, দেশের সংবিধানের কাছে, প্রশাসনিক কাঠামোর কাছে বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নেই। রাষ্ট্রক্ষমতার অধীশ্বররা তাঁদের 'অপর' বলে চিহ্নিত করেছেন, সমনাগরিক হওয়ার সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকারটি থেকে তাঁরা বঞ্চিত। শুধু এই দু'টি রাজ্যের কথা নয়, দেশের সংখ্যালঘু মানুষের মাথার উপরে নয়া নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিকপঞ্জির খড়্গ ঝুলিয়ে রেখে কি প্রতিনিয়ত তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয় না যে, রাষ্ট্রের চোখে তাঁদের সমনাগরিকত্বের মৌলিক দাবিটি স্বীকৃতি পায় না? এ কেমন 'স্বাধীনতা'?

যেখানে প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক হিংসা অথবা ডিটেনশন ক্যাম্পের জুজু নেই, সেই পরিসরগুলিও কি স্বাধীন? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আক্রান্ত হয়েছে মসজিদ-চার্চ, গোরক্ষকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন সংখ্যালঘু মানুষ, এখন প্রকাশ্যে সংখ্যালঘুর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হচ্ছে; উচ্চবর্ণের পাত্র থেকে জল পান করার 'অপরাধ'-এ খুন হয়েছে দলিত বালক, গণধর্ষিতা হয়েছেন নারী। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে জেলে বন্দি বহু মানুষ; তথ্যের নিরাপত্তা আইনের মোড়কে নাগরিকের উপর নজরদারির ব্যবস্থা আরও পাকা হচ্ছে। উদাহরণের তালিকা দীর্ঘতর করা অনাবশ্যক। এই সন্দেহ অস্বাভাবিক নয় যে, বর্তমান ভারতে স্বাধীনতা বহাল আছে মুখ্যত হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের নাগরিকদের জন্য, অর্থাৎ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হিন্দিভাষী উচ্চবর্ণের পুরুষদের জন্য, অবশ্যই শাসকদের প্রতি আনুগত্য সাপেক্ষে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-বাসস্থান-লিঙ্গ-যৌনতা— অক্ষগুলির যে কোনওটিতে যাঁরা 'অপর', তাঁদের জন্য অধিকারলঙ্ঘনই বরাদ্দ। এবং, তার চালিকাশক্তি হল বিদ্বেষ ও ঘৃণা, যা ক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করে 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠছে। প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, পরাজিত হচ্ছে নাগরিক স্বাধীনতার অলঙ্ঘ্য অধিকার।

তবে কি এই পরাজয়ই সত্য? ক্রমে গাঢ়তর অন্ধকার সেই আশাহীনতার দিকেই ঠেলে দিতে চায় বটে, কিন্তু তা-ই শেষ সত্য নয়। এ কথাও তো মিথ্যা নয় যে, বিরোধী রাজনীতির পরিসর থেকেই স্লোগান উঠেছে, ঘৃণার বাজারে ভালবাসার দোকান খুলতে হবে। কোন নেতার কোন কর্মসূচিতে এই স্লোগানের জন্ম, তা গৌণ প্রসঙ্গ। আশার কথা এইটুকুই যে, ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতেই এখনও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সহমর্মিতার কথা বলা যায়— ঘৃণা দিয়ে ঘৃণার শোধ তোলা নয়, ভালবাসা দিয়ে শুশ্রূষা করার কল্পনা এখনও সম্ভব। আজকের মতো অন্ধকার সময় স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কখনও আসেনি, এমনকি ১৯৭৫ সালেও নয়; কিন্তু সেই অন্ধকারের নির্মোক ভেদ করে ভারত নামক ধারণাটির প্রদীপ ক্রমে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, রাজনীতির পরিসরেই এই আশার কারণ রয়েছে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

The Digital Personal Data Protection Bill তথ্যের অস্ত্র

ব্যক্তির সংজ্ঞা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে এমনকি রাষ্ট্র বিষয়ক তথ্য পাওয়া বা না-পাওয়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপরে নির্ভরশীল হবে, তেমন আশঙ্কা প্রবল।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, ‘ব্যক্তি’ কাকে বলে, সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়া ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিল থেকে তার একটি বিচিত্র সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। সেই বিলে ‘পার্সন’ বা ব্যক্তির সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল বা একক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, কোনও কোম্পানি, কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা, একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত কোনও সংগঠন, এবং রাষ্ট্রের। ‘ব্যক্তি’-র সংজ্ঞার এ-হেন স্ফীতির তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তথ্যের অধিকার আইনে। সেই আইনের ধারায় বলা আছে, ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত কোনও তথ্য, যেটির সঙ্গে জনসাধারণের কার্যকলাপ বা জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই বা যার ফলে কারও ব্যক্তিগত পরিসরে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা হবে, তাকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হবে। তবে যদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, জনস্বার্থে এই তথ্য প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে, তবেই সেই তথ্য জনসমক্ষে আনা সম্ভব। অর্থাৎ, ব্যক্তির সংজ্ঞা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে এমনকি রাষ্ট্র বিষয়ক তথ্য পাওয়া বা না-পাওয়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপরে নির্ভরশীল হবে, তেমন আশঙ্কা প্রবল। সেই বিবেচনা বা নিয়ন্ত্রণের ফল কার পক্ষে অনুকূল হবে, বলে দেওয়ার দরকার পড়ে কি?

এক দিকে যদি সরকার, শাসনবিভাগ বা রাষ্ট্রকে জনগণের নজরদারির বাইরে নিয়ে আসা থাকে, অন্য দিকে রয়েছে জনগণের উপরে নজরদারি বৃদ্ধির আশঙ্কা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, বিলটি ডিজিটাল দুনিয়ায় আমজনতার ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা বজায় রাখবে। অথচ, এই আইন থেকে তাদের নিরাপত্তা, গোয়েন্দা এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা তারা নিজেদের হাতে রাখছে। বিল-এ এও বলা হয়েছে, সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে যে কোনও সরকারি সংস্থাকে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যে নজরদারি বা তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা দিতে পারবে। প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বরে বিলের একটি খসড়া সংসদে পেশ করার পর তাতে কিছু অদলবদল করে বর্তমানে সেটি সংসদে পুনরায় পেশ করা হয়। বিলের কিছু বিতর্কিত অংশ নিয়ে এমনিতেই বিভিন্ন মহলে ছিল উদ্বেগ। সেই সব উদ্বেগকে স্থায়ী রূপ দিয়েই পাশ হল বিলটি। দু’টি আশঙ্কাই মূলগত ভাবে যুক্ত এই সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার চরিত্রলক্ষণে। রাষ্ট্র নিজের তথ্য নাগরিকের থেকে যথাসম্ভব আড়াল করতে চায়, কিন্তু নাগরিকের যাবতীয় তথ্য নিয়ে আসতে চায় নিজের নজরদারির আওতায়— অর্থাৎ, গণতন্ত্রের পরিসরে জবাবদিহি করার দায়টি স্বীকার করতে রাষ্ট্র রাজি নয়, কিন্তু নাগরিককে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে উদ্‌গ্রীব। এক দিকে প্রশ্ন করার অবকাশ হ্রাস করা, এবং অন্য দিকে কেউ সেই দুঃসাহস দেখালে তাকে বিবিধ নাগপাশে আবদ্ধ করা, এ লক্ষণ একাধিপত্যকামী শাসকের। ভারত কোন পথে চলেছে, সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই তার নির্ভুল সঙ্কেত পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিলটি যত বার পাল্টেছে, তত বারই তার অবয়বে ফুটে উঠছে ঘুরপথে শাসনের ফাঁস কঠোরতর করার অপপ্রয়াস। এখানেই নাগরিক সমাজের দায়িত্ব। সরকার যদি জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় ব্যাকুল হয়, তবে সর্বদা সজাগ থাকাই কর্তব্য।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Migrant Workers শ্রমিকের কল্যাণ

গঠন হওয়ার পরেই পরীক্ষার মুখে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ। হরিয়ানার নুহ জেলায় সাম্প্রদায়িক হিংসার মুখে পড়ে কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরতে বাধ্য হলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। ধর্ম বা ভাষার ভিন্নতার জন্য বাঙালি শ্রমিকের উপর আক্রমণকে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরদাস্ত করবে না, সে বিষয়ে শক্তিশালী বার্তা সারা ভারতের সামনে তুলে ধরার এই ছিল সুযোগ। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে, এবং নিয়োগকারীদের থেকে বকেয়া মজুরি আদায় করতে শ্রমিকদের সহায়তা করতে পারত পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ। যে বিতাড়িত শ্রমিকরা ফের হরিয়ানায় কাজে ফিরতে ইচ্ছুক, তাঁদের সুরক্ষার জন্য পর্ষদ কর্তারা হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ করতে পারতেন। তাতে আশ্বস্ত হতেন শ্রমিকেরা। আক্ষেপ, কার্যক্ষেত্রে সে সব শোনা গেল না। বদলে শোনা গেল চর্বিতচর্বণ— পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত কিছু সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বিতাড়িত মজুরেরা, এবং রাজ্যেই তাঁদের বিকল্প কাজ দেওয়ার চেষ্টা হবে, সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পর্ষদ কর্তারা। এত দিন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী-আধিকারিকরা যে বয়ানটি প্রচার করে গিয়েছেন, এখন তারই প্রচার করছে পর্ষদ। বয়ানটি গোলমেলে। ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ রাজ্য সরকার এ রাজ্যে প্রচুর কাজ তৈরি করেছে, এমন চিন্তায় স্বচ্ছতার অভাব। এ রাজ্যে যে যথেষ্ট কাজ, যথেষ্ট রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়নি, সে কথা স্বীকার করাই ভাল। রাজ্য সরকার দু’লক্ষ কাজ তৈরির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে সাংবাদিকদের। প্রশ্ন হল, রাজ্য সরকারের আন্দাজ অনুসারেই যখন এ রাজ্যের অন্তত আটত্রিশ লক্ষ শ্রমিক বাইরে কাজ খুঁজতে যান, তখন দু’লক্ষ কাজের হিসাব দিয়ে লাভ কী?

পর্ষদের কর্তাদের ঘোষণা, পর্ষদের মাধ্যমে ভিন রাজ্যগামী শ্রমিকের নথিভুক্তি ও প্রশিক্ষণ হবে, এবং রাজ্যেই কর্মনিযুক্তির চেষ্টা হবে। প্রশ্ন উঠবে, কেন? শিল্পের প্রয়োজনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা সময়ে, নানা ধরনের কাজ সৃষ্টি হয়। সেই অনুসারে শ্রমিকের প্রয়োজনেও সব সময়েই ওঠা-পড়া চলতে থাকে। পরিযায়ী শ্রমিকরা শিল্পের সেই চাহিদা মেটান, পরিবর্তে লাভ করেন বাড়তি মজুরি, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতাও। ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া তাই শ্রমিক-স্বার্থ পরিপন্থী নয়। সবল অর্থনীতির জন্যও তা প্রয়োজন। সর্বোপরি, ভারতের সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে যে কোনও রাজ্যে কাজের অধিকার দিয়েছে। সেই মৌলিক অধিকারের সুরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতাকে সরকারি প্রকল্পের বাহুল্য দিয়ে ঢাকা যায় না।

বাস্তব এই যে, এ রাজ্যের চাইতে পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে কাজের জোগান বেশি, এবং পারিশ্রমিকের হারও বেশি। এই কারণেই কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে কাজ করছেন লক্ষ লক্ষ বাঙালি শ্রমিক। সব কর্মক্ষম মানুষের জন্য যথেষ্ট কাজ, যথেষ্ট রোজগার জোগান দিতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গে তেমন শ্রমনিবিড় শিল্প কোথায়? সরকারি অনুদানের খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে খেতমজুর, দিনমজুরের সংসার চলে না। সরকারি প্রকল্পের কাজ তাঁদেরকে দারিদ্রের ফাঁদে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে মাত্র। কর্মনিযুক্তির সুযোগ রাজ্য সরকার বাড়াতেই পারে। তা বলে শ্রমিক-নিষ্ক্রমণ কমানো, বা পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের জায়গায় বাঙালি শ্রমিকের নিয়োগ— এগুলি পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের লক্ষ্য হয় কোন যুক্তিতে? রাজ্যের যে মজুররা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন, এবং অন্য রাজ্যের যে মজুররা এ রাজ্যে আসছেন, তাঁদের অধিকারের সুরক্ষা এবং তাঁদের পরিবারের সহায়তাই শ্রম দফতর, তথা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের প্রধান কর্তব্য। তার জায়গায় বিকল্প কাজ সরবরাহ, বা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে অর্থ সহায়তা— এ সব কর্মসূচি শ্রমিক কল্যাণের কেন্দ্রে থাকতে পারে না।

Plastic নির্বিকল্প প্লাস্টিক

আগামী ২ অক্টোবর থেকে অসমে নিষিদ্ধ হতে চলেছে ১ লিটারের কম আয়তনের পানীয় জলের বোতলের উৎপাদন ও ব্যবহার। আগামী বছর অক্টোবর মাস থেকে সে রাজ্যে নিষিদ্ধ হবে ২ লিটারের কম আয়তনের পানীয় জলের বোতলও। সম্প্রতি নাগাল্যান্ডেও প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্লাস্টিকের ব্যাগই নয়, প্লাস্টিকের থালা, বাটি, গেলাস, বেলুনের কাঠি, আইসক্রিমের চামচ, নিমন্ত্রণ পত্র-সহ বহুবিধ জিনিসের ব্যবহার, উৎপাদন, বিক্রি, মজুতকরণ একই সঙ্গে নিষিদ্ধ করেছে তারা। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার এক বছর অতিক্রান্ত। অথচ, দোকান-বাজারে এখনও দেখা মেলে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের। আগের মতোই অতি বৃষ্টিতে প্লাস্টিকের স্তূপ আটকে দেয় নিকাশির মুখ। শহরে কিছু সচেতনতার ছবির খোঁজ পাওয়া গেলেও জেলায় তার ছিটেফোঁটাও নেই।

স্বল্প দাম, সহজলভ্য এবং টেকসই হওয়ার কারণেই প্লাস্টিকের বিপুল চাহিদা। ফলে, তাকে বাজার থেকে সম্পূর্ণ সরানোর জন্য প্রয়োজন অল্প দামে, ভাল গুণমানের এক বা একাধিক বিকল্প উপাদানের সন্ধান, যা দিয়ে ব্যাগের পাশাপাশি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রও তৈরি করা যাবে। পাট এবং পাটজাত দ্রব্য অনেকাংশে সেই জায়গাটি নিতে পারত। পরিবেশবিদরাও ইতিপূর্বে বহু বার প্লাস্টিক বর্জন করে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের চটকলগুলির অবস্থা দেখলে বিকল্পটির প্রতি ভরসা রাখা কঠিন। কাঁচা পাটের অভাব, পুরাতন প্রযুক্তির ব্যবহার, মালিক-শ্রমিক বিবাদ-সহ নানা কারণে চটকলগুলি ধুঁকছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য ভরার কাজে একশো শতাংশ, এবং চিনির মোড়কের জন্য কুড়ি শতাংশ চটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। রাজ্য থেকে চটের বস্তা কিনে নেয় কেন্দ্র। অথচ পরিস্থিতি এমনই যে, সেই বস্তাও রাজ্যের চটকলগুলি সরবরাহ করে উঠতে পারে না। অন্যান্য সামগ্রী দূর অস্ত্।

অপর দিকে, প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে কাগজ টেকসই নয়। পুরনো কাপড় দিয়ে ব্যাগ তৈরির প্রয়াস বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিলেও তার ব্যবহার সমাজের নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ। শালপাতা, কলাপাতার বাক্স, বেত কিংবা সুপারির পাতা দিয়ে থালা, বাটি তৈরির বিচ্ছিন্ন চেষ্টাও চোখে পড়ে। কিন্তু দাম প্লাস্টিকের তুলনায় বেশি। প্রয়োজনের সময় ক্রয় করতে পারার মতো দোকানই বা কতগুলি আছে? সর্বোপরি, অধিকাংশটুকু এত দিন পরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই আবদ্ধ। একটি বহুলপ্রচলিত দ্রব্যকে সরিয়ে বিকল্প সামগ্রী ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সচেতন, নিখুঁত সরকারি পরিকল্পনা, উদ্যোগের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে তা অনুপস্থিত। কেন মানুষ এক অনায়াসলভ্য, সস্তার জিনিস ছেড়ে বিকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেই যুক্তিগুলিও প্রাথমিক পর্বের পর আর সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা হল না। তাই, বার বার প্লাস্টিক বন্ধের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে এলেই প্লাস্টিক স্বমহিমায় বাজারে ফেরে। লক্ষ্যপূরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগগুলিকে এক ছাতার তলায় আনা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালানো। সেই সদিচ্ছা কি প্রশাসনিক কর্তাদের আছে?

Electronics Goods লাইসেন্স রাজ

যখন এ দেশের পালে মুক্ত অর্থনীতির হাওয়া লাগেনি, তখন আমদানির রাশ টানতে নিয়মিত কোটা এবং উচ্চ শুল্কের মতো কড়া নীতি অবলম্বন করতে দেখা যেত কেন্দ্রীয় সরকারকে। সেই আত্মঘাতী নীতির কুফল আজ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও বর্তমান সরকার যেন 'পিছিয়ে যাওয়ার নীতি' অবলম্বনেই পুনরায় উৎসুক। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ কম্পিউটার, ল্যাপটপ-সহ হরেক ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্স চালুর সিদ্ধান্ত। যদিও বিপুল সমালোচনার কারণে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেড তাদের এই সিদ্ধান্ত আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল করেছে। সরকারের বহু হঠকারী সিদ্ধান্তের মতোই এ ক্ষেত্রেও যে প্রয়োজনীয় বিচার-বিবেচনা করা হয়নি, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। আশঙ্কা, এতে লাল ফিতের ফাঁসের সমস্যা আরও প্রকট হবে। আগামী দিনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে এমন 'লাইসেন্স নীতি' চালু হবে না, উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না সেই সম্ভাবনা।

বলা হচ্ছে, সরকারের এ-হেন পদক্ষেপের লক্ষ্য দেশে তৈরি কম্পিউটার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসাবৃদ্ধি এবং চিন থেকে আমদানি হ্রাস। ২০২২-২৩ সালে প্রায় ৫৩০ কোটি ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ল্যাপটপ-সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি করে ভারত, যার সিংহভাগই আসে চিন থেকে। পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে তথ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। যদিও পরে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয় যে, সরকার এমন প্রযুক্তি ও হার্ডওয়্যারে আগ্রহী, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচুরির আশঙ্কা ন্যূনতম। লক্ষ্যগুলি পূরণ করা নিঃসন্দেহে জরুরি। সরকার যদি প্রযুক্তির নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়, তবে সে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি বন্ধ রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য লাইসেন্স নীতি পুনরায় চালু করা প্রয়োজন ছিল কি? সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নির্বিঘ্নে চালু করা হবে লাইসেন্স প্রক্রিয়াটি। কিন্তু তা চালু হলে, পূর্বপরিচিত বহু সমস্যারই যে পুনরাবির্ভাব ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয়। এর ফলে অবধারিত ভাবে প্রভাব পড়বে পণ্যের লভ্যতা এবং দামের উপরে। তা ছাড়া, এ দেশে তো 'পাইয়ে দেওয়া'র রাজনীতি অতি সক্রিয়। ফলে আজকের পরিষেবা-নির্ভর অর্থনীতিতে যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের গুরুত্ব অপরিসীম, সেখানে বাজারে এই ধরনের পণ্যের ঘাটতি এবং দামের তারতম্য এই শিল্পের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। এবং এর পরিণতি হবে সুদূরপ্রসারী। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়াই যদি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বপ্ন হয়, তবে বর্তমান নীতিটি প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়।

দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি সরকারের লক্ষ্য হলেও, ইতিহাস সাক্ষী যে আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা ও লাইসেন্স নীতি সেই বৃদ্ধিতে কোনও সাহায্য করে না। বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের রফতানিকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক বাণিজ্যে তার স্থান তৈরির ক্ষেত্রেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে, কম্পিউটার এবং এই ধরনের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের বাণিজ্যের এক বিশেষ ধরন রয়েছে, যা দেশে রাতারাতি গড়ে তোলা অসম্ভব। নিজেদের নীতির কারণেই দক্ষ কর্মীর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারত বিশ্বমঞ্চে এ ক্ষেত্রে সক্ষম হয়নি। ফলে এই ধরনের শিল্পবিরোধী নীতি বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি যত শীঘ্র দেশের নীতি নির্ধারকরা উপলব্ধি করবেন, তত দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে মঙ্গল।

Specially Abled Children বিভেদ নয়

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটু বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। প্রয়োজন, একটু সচেতন উদ্যোগের। অথচ এখনও সমাজ এই জায়গাটিতে বহু পিছিয়ে। মানসিকতার দিক থেকেও, উদ্যোগের অভাবেও। সম্প্রতি সেই চিত্রটিই আবার ধরা পড়ল যখন কিছু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী তাদের নিজস্ব দাবিগুলিকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরল পশ্চিমবঙ্গ শিশু-অধিকার সুরক্ষা কমিশনের মঞ্চে। তাদের মধ্যে এক জন, অষ্টম শ্রেণির রিয়া সর্দার একটি দিনের জন্য কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদটি অলঙ্কৃত করেছিল। সঙ্গে ছিল আরও চার শিক্ষার্থী। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ৩০ জুলাই আন্তর্জাতিক মানব পাচার প্রতিরোধী দিবসে এই অভিনব পদ্ধতিটি কমিশনের পক্ষ থেকে অনুসরণ করা হয়। সমাজের নানা স্তর থেকে আগতরা এক দিনের জন্য এই পদে বসেন এবং তাঁদের নিজস্ব দাবিগুলি তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীর কাছে। সেই ধারাতেই রিয়া ও তার সঙ্গীরা জোর দিয়েছে তাদের প্রয়োজনগুলির উপরে— স্কুল-অফিসে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা, গণপরিবহণের সুবিধা লাভ, যৌন নির্যাতন ও শিশুশ্রমিক হিসাবে ব্যবহারের হাত থেকে বাঁচাতে উপযুক্ত সুরক্ষাবর্ম ইত্যাদি। এবং তারা চেয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে তাদেরও যেন শামিল করা হয়। “আমাদের ছাড়া, আমাদের জন্য কিছু নয়”, এমনটাই জানিয়েছে তারা।

দাবিগুলির মধ্যে অ-সাধারণত্ব কিছু নেই, যা প্রশাসন ও সমাজ তাদের দিতে অপারগ। অথচ, নানা অজুহাতে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে অধিক। স্কুলগুলো শিশুর জীবন গড়ার প্রথম সোপান। অথচ, সেখানেই তাদের খামতি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়। তাদের সমস্যাগুলিকে যত্ন করে সমাধান করার পরিবর্তে সেগুলি অগ্রাহ্য করাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। যারা সাঙ্কেতিক ভাষায় অভ্যস্ত, তাদের কথা শোনা ও বোঝার মতো কেউ থাকে না। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয় তাদের। সর্বোপরি, অনেক ক্ষেত্রে স্কুলই জোর দেয় আলাদা স্কুলের ব্যবস্থা করার জন্য। অথচ, তাদের সকলের বিশেষ স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যাদের সমস্যাগুলি মৃদু থেকে মাঝারি, তাদের সাধারণ স্কুলেই পড়ার উপর বিশেষজ্ঞরা বারংবার জোর দিয়েছেন। সেই পরামর্শ মানা হয় কতগুলি স্কুলে? ২০১২ সালের শিক্ষার অধিকার আইন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতে যুক্ত করার কথা বলেছে। তাতেও পরিস্থিতি বিশেষ পাল্টায়নি।

শুধু তো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা নয়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যারা পড়ার গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, তাদের জন্য আলাদা ক্লাস, আলাদা ব্যবস্থা করার কথা ভাবে কতগুলি স্কুল? স্কুলের অনুষ্ঠান, স্পোর্টসেও সেরাদেরই জয়জয়কার। দুর্বলদের উপস্থিতি অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর করতে দেবে না— এই ভয় অলক্ষ্যে কাজ করে। ফলে ক্রমাগত অনুৎসাহ প্রদান, অসহযোগিতার কারণে বিভেদ তীব্র হয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ আরও বাড়ে। সমাজ এখনও ‘অপর’কে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে শেখেনি। সেই শিক্ষার প্রাথমিক ভারও কিন্তু শিক্ষালয়ের উপরেই বর্তায়। এক আদর্শ বিদ্যালয় সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেবে, যারা পারল না তাদের এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ দেখাবে, সেটাই কাম্য। এমন উদ্যোগ যে প্রায় চোখেই পড়ে না— সেই মর্মান্তিক সত্যটিই সামনে আনল রিয়া ও তার সঙ্গীরা।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Child Trafficking নিকৃষ্ট অপরাধ

শিশু বিক্রির মতো জঘন্য অপরাধ ঘটে চলেছে রাজ্যের আইভিএফ সেন্টারগুলির একাংশে। কলকাতার নোনাডাঙা রেল কলোনি এলাকার এক সদ্যোজাতকে বিক্রির অভিযোগের তদন্ত করতে নেমে পুলিশ জেনেছে, বেশ কিছু সুপরিচিত নার্সিংহোম, আইভিএফ সেন্টার এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা শিশু বিক্রির সঙ্গে জড়িত। ইতিপূর্বেই এমন ইঙ্গিত মিলেছিল যে, আইভিএফ চিকিৎসার কেন্দ্রগুলিকে ব্যবহার করে শিশুপাচার চক্র নানা রাজ্যে সক্রিয় হয়েছে। এ বছরই মার্চ মাসে শিলিগুড়িতে পুলিশ ফাঁদ পেতে ধরেছিল চার দুষ্কৃতীকে, যারা সাত লক্ষ টাকার বিনিময়ে সাত দিনের শিশুকন্যাকে বিক্রির চেষ্টা করছিল। ওই শিশুকে আনা হয়েছিল বিহারের একটি আইভিএফ সেন্টার থেকে। গত দু'-তিন বছরে বিভিন্ন জেলা-শহরে শিশু বিক্রির ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে নার্সিংহোমের আয়া এবং অন্যান্য কর্মী জড়িত। এই দালাল বা মধ্যস্থতাকারীদের ধরাই যথেষ্ট নয়, তাদের পিছনে কোনও বড় সংগঠক রয়েছে কি না, তা-ও জানা জরুরি। প্রশাসনিক নজরদারি এড়িয়ে কী করে এমন চক্র গড়ে উঠতে পারল? ভুলে যাওয়া চলে না, ২০১৭ সালে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের হোম থেকে শিশুপাচারের তদন্তে নেমে সিআইডি দু'টি জেলার শিশুসুরক্ষা আধিকারিক এবং দার্জিলিঙের শিশুকল্যাণ কমিটির সদস্য এক ডাক্তারকেও রেখেছিল চার্জশিটে। অন্তত সতেরোটি শিশুকে বেআইনি ভাবে দত্তক দেওয়াতে তাঁদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছিল সিআইডি। উত্তর ২৪ পরগনায় শিশুপাচার চক্রের সঙ্গে হোম কর্তৃপক্ষের ও জেলার 'স্পেশালাইজ়ড অ্যাডপশন এজেন্সি'-র যোগসাজশ মিলেছিল। অতএব দালালদের ধরাই যথেষ্ট নয়, সংগঠিত অপরাধ চক্রটিকে প্রকাশ্যে আনা দরকার।

শিশু বিক্রির যে ঘটনাগুলি সংবাদে এসেছে, সেগুলিতে পাড়া-প্রতিবেশীই বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। তার পরে তদন্তে নামছে পুলিশ। প্রশ্ন হল, এই চক্রগুলি যে সক্রিয় রয়েছে, তা জেনেও রাজ্য পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আইভিএফ কেন্দ্র এবং নার্সিংহোমগুলিকে সতর্ক করেনি কেন? নজরদারি আরও কড়া হয়নি কেন? কেনই বা নারী ও শিশুকল্যাণ দফতর, বা শিশু-অধিকার সুরক্ষা কমিশনের তরফ থেকে শিশু কেনা-বেচার ঝুঁকির বিষয়ে প্রচার করা হয়নি? অভিভাবকহীন শিশুকে গ্রহণ, এবং দত্তক দানের বৈধ ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষকে, বিশেষত শিশুসন্তান গ্রহণে আগ্রহী দম্পতিদের যথেষ্ট অবহিত করা দরকার। শিশুকে ভরণপোষণের জন্য যে কারও হাতে তুলে দেওয়া, বা সে বিষয়ে মধ্যস্থতা করা যে বেআইনি, তা অনেক দরিদ্র মানুষ এখনও জানেন না। হাসপাতাল, নার্সিংহোমের এক শ্রেণির কর্মী তার সুবিধা নেন।

নতুন প্রযুক্তির সুবিধার বিপরীতে সব সময়েই থাকে নতুন ধরনের প্রতারণার ঝুঁকি। আইভিএফ, সারোগেসি প্রভৃতি প্রযুক্তির অপব্যবহার করে মানবশরীরকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র করে তোলা, এবং শিশুকে পণ্য করে ফেলার নিদর্শন ভারতে কম নেই। এ সব রুখতে আইন ও বিধি কঠোর করা হয়েছে। শিশু চুরি, শিশুপাচারের পুরনো চক্রগুলো যাতে এই কাজে লাগাতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে নার্সিংহোম, আইভিএফ কেন্দ্রের পরিচালকদেরও। শিশুকে পণ্য করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Gig Workers সুরক্ষার দায়

গিগ কর্মী, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্বার্থরক্ষায় আইন পাশ করে ভারতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল রাজস্থান। অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবায় নিযুক্ত এই কর্মীরা প্রধানত বাড়িতে পণ্য পৌঁছে দেন। এই আইনের ফলে নিয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ডেলিভারি পিছু 'লেভি' সংগ্রহ করা হবে, যা দিয়ে তৈরি হবে ডেলিভারি কর্মীদের কল্যাণ তহবিল। তা থেকে গিগ কর্মীদের নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলৌত স্বয়ং এই তহবিলের পরিচালনা সমিতির শীর্ষে থাকবেন। গিগ কর্মীদের প্রতিনিধি, এবং তাঁদের নিয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধি-সহ একটি কল্যাণ পর্ষদও তৈরি হবে। উদ্যোগটি সাধু। গিগ শ্রমকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা ভারতে উদ্‌ভূত হয়েছে, সরকার তার নিরসনে একটি পক্ষ হিসাবে এগিয়ে না এলে, এক দিকে বাজারের নমনীয়তা বজায় রাখা, এবং অপর দিকে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার সূত্র মেলা সহজ হত না। সমস্যাটি নিহিত আছে 'গিগ' কাজের ধরনটিতেই। নিয়োগকারী সংস্থাগুলি গিগ কর্মীদের চুক্তিকর্মী (কনট্র্যাকটর), স্বাধীন কর্মী (ফ্রিল্যান্সার) অথবা অংশীদার (পার্টনার) হিসাবে গণ্য করে, এবং বাজারে চাহিদার ওঠা-পড়া অনুসারে চুক্তির শর্তে বদল করতে দ্বিধা করে না। মুক্ত বাজারে তেমনই দস্তুর। সমস্যা এই যে, 'অংশীদার' বা 'চুক্তিকর্মী' বলতে যা বাস্তবিক বোঝায়, গিগ কর্মীদের প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। তার প্রধান কারণ, চুক্তির শর্তের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কার্যত কিছুই নেই। অন্য দিকে, শ্রমবিধি কর্মীদের যে সব সুরক্ষা দেয়, সেগুলিও পান না গিগ কর্মীরা। অতীতে এমনও দেখা গিয়েছে যে, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই চল্লিশ শতাংশ কমানো হয়েছে মজুরি, যার জেরে কর্মবিরতি করেছেন কর্মীরা। বিশ্বের নানা দেশে গিগ অর্থনীতিতে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে বার বার শোরগোল উঠেছে। সমাধানের আশায় অনেক ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর শ্রমিকের স্বীকৃতি দাবি নিয়ে আদালতে গিয়েছেন গিগ কর্মীরা।

সাবেক শ্রমিক সংগঠনগুলির সংঘাতপূর্ণ, অপচয়ী কৌশলে গিগ কর্মীদের সমস্যার নিরসন খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। শ্রমিককে তাঁর দক্ষতা, কার্যক্ষমতার সীমা অবধি বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রেরই কাজ। অতিরিক্ত কাজ আদায়, যৎসামান্য মজুরি, বা সবেতন ছুটি থেকে শ্রমিকের বঞ্চনা কখনওই দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পের উন্নতি বা প্রসারের অনুকূল হতে পারে না। আর স্বল্প মেয়াদে লাভকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া ধনতন্ত্রের ধর্ম নয়। শ্রমিক কল্যাণ এবং নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষার সরকারি ব্যবস্থায় শিল্পগুলি যোগ দেয় উদারবাদী অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই। অপর পক্ষে, কর্মীদের একটি বড় অংশও গিগ অর্থনীতির সুবিধা বুঝেছেন। ইচ্ছামতো কাজে যোগ দেওয়া, প্রয়োজন মতো কাজ করে বাড়তি রোজগারের সুযোগ গ্রহণ করতে অনেকেই আগ্রহী। এর ফলে বাজারে নতুন নতুন পরিষেবার চাহিদা তৈরি হয়, তা দেখা গিয়েছে সমীক্ষায়। তাতে কাজ পাওয়ার সুযোগও বাড়ে। প্রধান সমস্যা, সুরক্ষার অভাব। কাজেই, সেই বাজারটিকে যথাযথ পথচালিত করা সরকারের কর্তব্য।

নিয়োগকারী সংস্থাগুলি গিগ কর্মীর সঙ্গে চুক্তিতে কী শর্ত রাখবে, তা নির্দিষ্ট করা সরকারের কাজ নয়। তবে বাজারের স্বার্থে শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারেরই কাজ। রাজস্থান সরকারের আইনটি সেই উদ্যোগ করল। উদ্বেগ অবশ্য রয়ে গেল। ভারতে নানা ধরনের কাজের সঙ্গে (নির্মাণ, পরিবহণ, বিড়ি প্রভৃতি) যুক্ত কর্মীদের জন্য কল্যাণ পর্ষদ এবং বিশেষ তহবিল অনেক রয়েছে। আক্ষেপ, শ্রমিকদের সদস্য হিসাবে নথিভুক্তি, এবং সদস্য পদের নবীকরণে বহু ফাঁক থেকে যায়। তহবিলে টাকা থাকলেও তা থেকে যথাযথ সহায়তা মেলে না কর্মীদের। কোভিডের সময়ে এর প্রমাণ মিলেছিল। অতএব পর্ষদ গঠন বা তহবিল নির্মাণ গিগ কর্মীদের কল্যাণে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র, এমনই ভাবা যেতে পারে।

Cyber Crime স্বার্থরক্ষা

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালে দু’এক দিন অন্তর এক বিশেষ গোত্রের সংবাদ চোখে পড়ে— অনলাইন জালিয়াতি। কেউ দুষ্কৃতীদের ওটিপি দিয়ে ঠকেছেন, কেউ কোনও লিঙ্কে ক্লিক করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কেউ লোভের বশে অপরাধীদের ফাঁদে পা দিয়েছেন, কেউ আবার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। খুঁজলে ভুক্তভোগীদের মধ্যে দু’টি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাবে— এক, তাঁরা অনলাইন দুনিয়ার চালচলনের সঙ্গে তেমন অভ্যস্ত নন; এবং দুই, গত কয়েক বছরে ভারত যে দ্রুতগতিতে অনলাইন লেনদেনের পথে হেঁটেছে, তাতে তাঁরাও বাধ্য হয়েছেন সেই তালে তাল মেলানোর চেষ্টাতে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনলাইন লেনদেনের এই দ্রুত অগ্রগতি ভারতীয় অর্থব্যবস্থার পক্ষে সুসংবাদ, এবং সে-বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধুবাদও প্রাপ্য। কিন্তু, সেই অগ্রগতির দায় যদি প্রযুক্তি ব্যবহারে তুলনায় অদক্ষ মানুষদের উপরে বর্তায়— অভিজ্ঞতা বলছে, যাঁদের অধিকাংশই প্রবীণ নাগরিক— তা হলে বুঝতে হয়, পরিকল্পনায় ফাঁক থেকে গিয়েছে। এই ফাঁক অবশ্য বর্তমান সরকারের অভিজ্ঞান। কিছুই করা হয় না, বললে অবশ্য অনৃতভাষণ হবে। অনলাইন জালিয়াতি বিষয়ে নাগরিককে সচেতন করার জন্য জনজ্ঞাপন উদ্যোগ শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। সেই বিজ্ঞাপনে নাগরিককে জানানো হয়, অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন কাজগুলি নিরাপদ, কোনগুলি বিপজ্জনক। সচেতনতা তৈরির এই উদ্যোগের গুরুত্ব খাটো করে দেখানোর প্রশ্নই নেই। কিন্তু, সেটুকুই কি যথেষ্ট? সেই উদ্যোগ সত্ত্বেও যাঁরা প্রতারিত হবেন— হয়তো নিজেদের ভুলেই— তাঁদের কি সেই ভুলের মাসুল গুনে দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর থাকবে না?

গ্রাহকের প্রান্ত থেকে তথ্য চুরি যাওয়ার ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনই বিভিন্ন সংস্থার তথ্যভান্ডার থেকেও তথ্য চুরি যায়। সেই প্রবণতাও গোটা দুনিয়াতেই ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি একটি বৈশ্বিক সমীক্ষায় জানা গেল যে, দুনিয়ার সর্বত্রই এই ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় গ্রাহকের উপরে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে দোষের তিলমাত্রও গ্রাহকের নয়, সেই ক্ষেত্রেও তাঁরাই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। যে-হেতু কোনও এক জন গ্রাহক এবং কোনও একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার কোনও তুলনা চলে না, অতএব কোনও মধ্যস্থতাকারী শক্তি না থাকলে এই দ্বন্দ্বে প্রতি বারই গ্রাহকের পরাজয় নিশ্চিত। এখানেই সরকারের ভূমিকা। সমীক্ষা বলছে, তথ্য তছরুপের প্রবণতা ঠেকাতে কৃত্রিম মেধা ও অটোমেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে— যে সংস্থাগুলি এ কাজে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তাদের তথ্যচুরির ঘটনা কমেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। কিন্তু, সেই প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ, সেই কারণেই এখনও সিংহভাগ সংস্থা তা এড়িয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য। যে সংস্থা তথ্য তছরুপ এড়াতে সন্তোষজনক ভাবে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, তথ্য চুরি গেলে তার আর্থিক দায় সেই সংস্থার উপরে বর্তাবে, এমন একটি নিয়ম সিংহভাগ সংস্থাকেই দায়িত্বশীল করবে। অন্য দিকে, ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের ক্ষেত্রেও বিমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যেখানে জালিয়াতি হলে তার জন্য বিমার টাকা পাওয়া যাবে। বাজারব্যবস্থায় গ্রাহকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না।

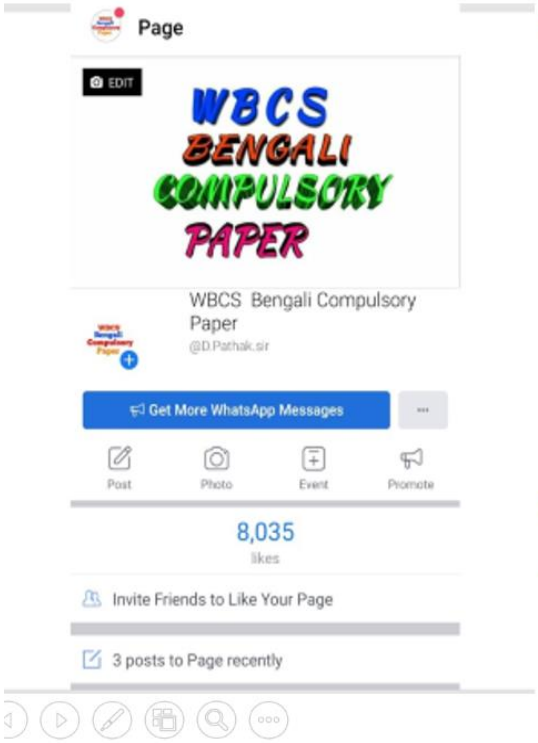

WBCS Bengali Compulsory Paper

- ❖ *Online class –Sunday 8am*
- ❖ *RECORDED VIDEO*
- ❖ *Log in id*
- ❖ *Mock test* - Monday and Friday
- ❖ Live mock - সোমবার ও শুক্রবার 9.30pm
- ❖ *Model Answer*
- ❖ CLASS -200/month
- ❖ WhatsApp: 8537872204

By Pathak sir

WBCS Bengali Compulsory Paper .com

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com

নিয়মিত অনুশীলন

LIVE MOCK

**বাড়ি থেকে পরীক্ষা -*প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে –*pdf করে লিখে পাঠাতে হবে। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার print করে খাতা দেখা হবে / খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে /লেখাগুলো 7047352328 নাম্বারে পাঠাতে হবে

- ❖ Fees - ₹ *100* / month
- ❖ WhatsApp: 8537872204

By Pathak sir